بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৮ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছিলেন, আমাদের অব্যাহতভাবে আত্মজিজ্ঞাসায় রত থাকা উচিত যে, আমাদের আমল বা কর্ম এবং সিদ্ধান্ত কুরআন ও হাদীস সম্মত কিনা। কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিষয়ের ব্যখ্যা পাওয়া না যায় মানুষ সেসব বিষয় নিয়ে ভাবে বা প্রণিধান করে যে সেগুলোর কীভাবে সমাধা করা যায়? এর রীতি হলো, উম্মতের মাঝে যেসব উলামা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের উক্তি এবং তাদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা। এ প্রসঙ্গে তিনি (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, মাসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের কীভাবে করা উচিত আর এ সম্পর্কে কোত্থেকে দিক-নির্দেশনা নেয়া উচিত? তিনি (আ.) বলেন, আমাদের রীতি হলো সর্বপ্রথম কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কুরআনে যদি কোন কথা না পাওয়া যায় তাহলে হাদীসে তা সন্ধান করা। আর হাদীসেও যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে উম্মতের ব্যাখ্যা এবং উম্মতে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দেয়া হয়েছে সেগুলোর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথাও বলেছেন যে, সুন্নতের মর্যাদা হাদীসের ঊর্ধ্বে। তাই যেসব বিষয় সুন্নতে বিদ্যমান সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এরপর হলো হাদীসের স্থান। সুন্নত তা-ই যা মহানবী (সা.) করে দেখিয়েছেন আর সাহাবীরা তা দেখে শিখেছেন। সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনরা তা শিখেছেন আর এভাবে এটি উম্মতে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করছেন যে, আমাদেরকে আমাদের জীবন-যাত্রার ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সেই কাজই করা উচিত যার অনুমতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের দেন।

অনেক সময় অনেকের মাথায় নেকী বা পুণ্য ভর করে বসে আর এক্ষেত্রে তারা এত দূরে চলে যায় যে, এক পর্যায়ে তা অতিরঞ্জনে পর্যবসিত হয়। নিজেদের প্রাণকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে। আর এমনও কিছু মানুষ আছে বরং অধিকাংশ মানুষ এমন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে আর যেভাবে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত সেভাবে মনোযোগ দেয় না। সুতরাং এই উভয় শ্রেণীর মানুষ রয়েছে বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনে শৈথিল্য দেখায়। পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদেরও কিছু উদাহরণ রয়েছে।

তিনি (রা.) একজন মহিলার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন যে অবৈধভাবে পুণ্যের নামে একটি কাজ করার অভিপ্রায় রাখত যা সত্যিকার অর্থে পুণ্য নয় কেননা; আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর অনুমতি দেননি। আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করব তাতে সেসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে যারা

অনেক সময় নিজেদের স্বপ্নকে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে থাকে, অথচ তাদের মর্যাদা এমন নয় যে কারণে বলা যেতে পারে, তাদের সব স্বপ্ন সত্য বা এর (যুক্তিযুক্ত) কোন অর্থও আছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ আমাদের ঘরে একজন মহিলা এসেছেন যিনি কাদিয়ানের এক প্রবীণ মহিলা। তার মাথায় কিছু সমস্যা আছে। সেই মহিলা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন, আর তিনি বলেন, যদি তুমি ছয় মাস অনবরত রোযা রাখ তাহলে খলীফাতুল মসীহ্ আরোগ্য লাভ করবেন। এটি প্রথম দিকের কথা যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অসুস্থ ছিলেন। সেই মহিলা বলেন, আমি যে আলেমকেই জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তরই দিয়েছেন যে, ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখা অবৈধ কাজ। এরপর তিনি বলেন, মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেব বলেছেন, তুমি বৃহস্পতিবার এবং সোমবারে রোযা রেখো। তিনি বলেন, কিন্তু এরপরও আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন এবং আমাকে বলেন, আমি তো তোমাকে ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখার কথা বলেছিলাম, তুমি কেন লাগাতার রোযা রাখছ না? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন তাকে বললাম, তোমার স্বপ্ন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও নিজের ইলহাম সম্পর্কে বলেন, যদি আমার কোন ইলহাম কুরআন ও সুন্নত পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে আমি তা কফ বা শ্লেষ্মার মত গলা থেকে বের করে ফেলে দেব। অতএব যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে নিজের ওহীকে কুরআন এবং সুন্নতের অনুগত করেন সেখানে আমাদেরও নিজেদের স্বপ্নকে তাঁর আদেশ নিষেধের অধীনস্ত করতে হবে। যেখানে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি উম্মতকে লাগাতার এভাবে দীর্ঘদিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন, তাই এই নির্দেশের পরিপন্থী কোন স্বপ্ন যদি তুমি দেখে থাক তাহলে সেটি শয়তানী স্বপ্ন গণ্য হবে। তুমি হয়তো বলবে, স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা বলেছেন কিন্তু একে ঐশী স্বপ্ন গণ্য করা হবে না, যদি ঐশী স্বপ্ন হতো তাহলে তা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের প্রত্যাখ্যান নয় বরং সত্যায়ন হতো। সুতরাং যেই স্বপ্ন কুরআন বা মহানবী (সা.)-এর ফতওয়া ও রীতি পরিপন্থী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য কেননা কুরআনের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন স্বপ্ন সত্য হতে পারে না এবং সুন্নতের পরিপন্থী স্বপ্নও সত্য হতে পারে না আর কোন সত্য স্বপ্ন সঠিক হাদীসেরও বিরোধী হতে পারে না।

অতএব স্বপ্নকে কোন বিষয়ের ভিত্তি মনে করা, তা যত পুণ্যই হোক না কেন, আর নিজেকে এমন কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়া যা সহ্য করা মানুষের জন্য সাধ্যাতীত এটি একটি ভ্রান্ত রীতি, আর শুধু ভ্রান্তই নয় বরং অনর্থক কাজ, অনেক সময় এটি পাপে পর্যবসিত হয়। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে দাঁড় করাতে চান তাদের সাথে খোদার ব্যবহার ভিন্ন হয়ে থাকে। তারা সমাজের সাধারণ মানুষ নন। কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের কোন তুলনা হয় না। এই ঘটনার ফলে কেউ হয়তো ভাবতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তো ছয় মাস রোযা রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক তাঁকে নবুয়্যতের আসনে আসীন করার ছিল। দ্বিতীয়ত স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে কী বলেছেন এবং কি নসীহত

করেছেন তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, **"একবার দৈবক্রমে পবিত্র চেহারার এক বয়স্ক পুণ্যবান ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি। ঐশী জ্যোতি নাযিল হওয়ার পূর্বে কিছু রোযা রাখা নবীকুলের রীতি এবং সুন্নত, এ কথা বলে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, আমি যেন রসূলদের আহলে বায়ত-এর এই রীতি অনুসরণ করি। তাই আমি কিছুদিন রোযা রাখা আবশ্যক মনে করি। এ ধরণের রোযায় বিস্ময়কর কল্যাণরাজির যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাহলো, সেই সূক্ষ্ম দিব্য দর্শন যা সেযুগে আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এরপর দিব্য দর্শন এবং ইলহামের এক লাগাতার ধারা সূচিত করেন।"** তখন কী-কী হয়েছে তিনি এরপর এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, **"বস্তুতঃ এত দিন রোযা রাখার ফলে আমার সামনে বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রকাশ পেয়েছে, আর তাহলো বিভিন্ন ধরণের দিব্য দর্শন,** (এটি স্মরণ রাখার মত কথা) তিনি (আ.) বলেন, **আমি সবাইকে এমনটি করার পরামর্শ দেব না আর আমি নিজের ইচ্ছায় এমনটি করি নি। স্মরণ রাখা উচিত, আমি সুস্পষ্ট দিব্য দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে আট বা নয় মাস পর্যন্ত দৈহিক ক্লেষের একটি অংশ বরণ করেছি, আর ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছি, এরপর অনবরত এই রীতির অনুসরণ বর্জন করেছি।"** অতএব আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মর্যাদা দেয়ার ছিল তাই তিনি এই অনুমতি পেয়েছেন কিন্তু এরপর তিনি এমনটি করা পরিহার করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **এরপর আমি কখনও কখনও রোযা রাখি।** আর একই সাথে অন্যদের এবং নিজের অনুসারীদের তিনি এমনটি করতে বারণ করেছেন।

এরপর আরেকটি অপবাদ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয় তা হলো, তিনি এসে একটি জামাত গঠন করে এক নৈরাজ্যের সূচনা করেছেন আর তাদের কথা অনুসারে তিনি মুসলমানদের ৭৩তম দল গঠন করেছেন। প্রয়োজন ছিল বিভেদ কমানোর কিন্তু তিনি একটি অতিরিক্ত দল গঠন করে দলাদলি আরও বৃদ্ধি করেছেন। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, নবীদের আগমনের সময় এমন কথা বলা হয়েই থাকে। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধেও এ ধরণের অপবাদই আরোপ করা হতো যে, তিনি ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। আমাদের বহুধা বিভক্ত করেছেন, শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাদের মাঝে নৈরাজ্য পূর্বেই বিরাজমান ছিল। আজকের মুসলমানদেরও অবস্থাও অভিন্ন, পূর্বেও তাদের এমন অবস্থা ছিল আর আজও রয়েছে। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিই তাদের মাঝে বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লা নবী প্রেরণ করেন নৈরাজ্যের অবসানের জন্য আর এক হাতে সমবেত হয়ে এরা যেন এক এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। যারা ঈমান আনে তারা নিরাপদ এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ হয়ে যায় আর অন্যরা বা বিরোধীরা নৈরাজ্যে লিপ্ত থাকে। আমাদের বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে যতই আমাদের বিরোধিতা করুক না কেন তা সত্ত্বেও নিজেদের মাঝে তারা বহুধা বিভক্ত, তাদের হৃদয় বহুধা বিখন্ডিত, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের নিজেদের মাঝে শত্রুতা এবং বিতন্ডা লেগেই আছে, আর যতক্ষণ এরা যুগ ইমামকে না মানবে এমনটি হতেই থাকবে। এরা আমাদেরকে মুসলমান বলুক বা অমুসলমান বলুক আর যে নামই রাখুক না কেন, আমরা খোদা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আর

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক প্রকৃত মুসলমান, আর মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া থেকে কেউ আমাদের বিরত রাখতে পারবে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এসব নৈরাজ্যের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, এক বন্ধু শুনিয়েছেন, একবার একজন আহলে হাদীস হানাফীদের মসজিদে তাদের সাথে জামাতে নামায পড়ছিল। আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় সে শাহাদাত অঙ্গুলী উত্তোলন করে। আঙ্গুল উঠাতেই অন্য সব নামাযীরা নামায ছেড়ে দিয়ে তার ওপর আক্রমন করে এবং তাকে হারামী হারামী বলে সম্বোধন করতে থাকে। হানাফীদের বিশ্বাস হলো, তাশাহ্হুদ-এর সময় আঙ্গুল উঠানো যাবে না বা তারা আঙ্গুল উঠায় না। তারা একবারও একথা ভাবলনা যে নামায পড়ছে, নামায ছেড়ে দেয়া কত বড় অন্যায়। তারা তার আঙ্গুল দেখছিল। তারা নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে গালি দেয়া আরম্ভ করে এবং দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব নৈরাজ্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পূর্বেই বিরাজমান ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে তো শুধু সংশোধন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, আঘাতকারী ফাসাদী হয়ে থাকে নাকি সেই ডাক্তার যে অস্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করতে উদ্যত হয়। দু'ধরণের মানুষ হয়ে থাকে যারা আঘাত দেয় বা আহত করে থাকে। প্রথম হলো সে যে কাউকে মেরে বা আঘাত করে আহত করে আর দ্বিতীয় হলো সেই ডাক্তার যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যথা দেয় বা আহত করে থাকে। কারো জ্বর হলে তাকে ডাক্তার যদি কুইনিন দেয় তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে, এই যালেম! মুখ তিতা করে দিয়েছে। যদি ডাক্তার শ্লেষ্মা বা কফ বের না করত তাহলে রোগ বেড়ে যেত, তাই শ্লেষ্মা বা কফ বের করলে আপত্তি কীভাবে করা যেতে পারে? হাড় ভেঙ্গে গেলে যদি অস্ত্রোপচার করে ক্ষত পরিষ্কার না করা হয়, তাতে যদি জ্বালা-পোড়া করে এমন ঔষধ প্রয়োগ না করা হয় তাহলে রোগ কীভাবে নিরাময় হতে পারে? এতে তো তার প্রাণও হুমকিগ্রস্ত হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে কেউ ডাক্তারকে কীভাবে দোষারোপ করতে পারে? সুতরাং ডাক্তার যদি কোন রোগীকে কষ্ট দেয় তাহলে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা দিয়ে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এই দলাদলি ও ভেদাভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, আপনি এসে দলাদলি বৃদ্ধি করেছেন, আগে নৈরাজ্যের কোন কমতি ছিল কি! তিনি (আ.) বলেন, **"আমাকে একটু বল, ভালো দুধ যদি সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে তা দইয়ের সাথে রাখা হয় নাকি পৃথক রাখা হয়? দুধ যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে দই থেকে পৃথক রাখতে হয়। দইয়ের ফোটাও যেন তাতে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। দইয়ের সাথে ভালো দুধ এক মিনিটও ভালো থাকতে পারে না। সুতরাং মনোনীত জামাতের রুগ্ন জামাত থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যক ছিল। এই যে জামাত বানিয়েছেন বা পৃথক দল গঠন করেছেন এটি মনোনীত বা প্রেরিত ব্যক্তির জামাত এবং এটিকে সেই জামাত এবং সেই লোকদের চেয়ে পৃথক করা আবশ্যক ছিল যারা পথহারা। যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি এড়িয়ে চলা না হয় তাহলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার রীতি হলো, আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাছ থেকে মনোনীত জামাতকে পৃথক রাখা। এ কারণেই খোদার নির্দেশ হলো জানাযা, বিয়ে, নামায ইত্যাদি যেন পৃথক হয়।** মহিলাদের নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন, **'অধিকাংশ**

মহিলা মতভেদ রাখে তাই মহিলাদেরকে নসীহত করছি, যেভাবে রোগাক্রান্ত মানুষের মাঝে সুস্থ মানুষের জীবনও হুমকিগ্রস্ত হয়, জেনে রাখ! অ-আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে। অধিকাংশ মহিলা বলে, ভাই বা বোনের বিয়ে হয়েছে, তাদেরকে কীভাবে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।' মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **'আমি সত্য করে বলছি, ভূমিকম্প আসলে বা আগুন লাগলে এক বোন ভাইয়ের ভ্রুক্ষেপ না করে বরং তাকে পেছনে ঠেলে ফেলে স্বয়ং সেই পতনোন্মুখ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্রুত চেষ্টা করবে। তাই ধর্মের বিষয়ে কেন এমনটি মনে করা হয়। সত্যিকার অর্থে এটি আরামপ্রিয়তারই একটি বহিঃপ্রকাশ।'** তিনি (রা.) বলেন, 'যদি এটিকে সমস্যা মনে করা হয়, বিপদ মনে করা হয়, তাহলে কেন পৃথক করা হলো, কেন আমরা ভিন্ন— এমন প্রশ্ন মাথায় উদয় হতো না।' তিনি (রা.) বলেন, 'বিপদের সময় এমন প্রশ্ন করা হয় না। তোমরা যেহেতু এখনও বোঝ না, এখনও যেহেতু তোমাদের ধর্মীয় বুৎপত্তি অর্জন হয়নি তাই এমন আরামপ্রিয়তার মন-মানসিকতা বিরাজ করছে। যদি সমস্যা কবলিত হতে তাহলে এমন কথা বলতে না। যদি খোদা তা'লা রাতে তোমাদের কারও কাছে আজরাঈলকে প্রেরণ করেন আর বলে যে, আমি তোমার ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের রূহ কবজ করার জন্য এসেছি কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার প্রাণ কবজ করছি তাহলে এমন ক্ষেত্রে কেউ বা কোন মহিলা এটি গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا" (সূরা আত্-তাহরীম: ৭) **অর্থাৎ অগ্নি থেকে নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা কর।** এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীনির যদি এক অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হয় তাহলে স্বামীর কারণে সে আহমদীয়াত থেকে অবশ্যই দূরে সরে যাবে বা তিলে তিলে মৃত্যু কবলিত হবে। আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে না গেলেও যা হয় তাহলো, কারও ঘরে যাওয়ার পর সে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তাকে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, এমনটি আজও হয়ে থাকে। সুতরাং এটি এক প্রকার অগ্নি। প্রশ্ন হলো নিজের স্বহস্তে কোন মা তার কন্যাকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? এভাবে এক সামান্য সম্পর্কের জন্য তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তাই এটি এড়িয়ে চলা উচিত।'

আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আহমদীরা অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে করে না বা বিয়ে দেয় না। এটি অনৈক্য নয় বরং আত্মরক্ষারই একটি চেষ্টা মাত্র। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ধারণা তার মাথায়ই জাগ্রত হতে পারে যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার চেতনা রাখে না, ছেলেরাও এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সেসব আহমদী ছেলে যারা আহমদী মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করে অ-আহমদী মেয়েদের বিয়ে করে। তাই ছেলেদের বুঝতে হবে, তারা যদি আহমদী হওয়ার দাবী করে আর সত্যিকার অর্থেই নিজেদের আহমদী মনে করে তাহলে শুধু ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়। বিয়ের সময় তাদের আহমদী বিয়ে করা উচিত। জাগতিক চাওয়া পাওয়ার ওপর নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ধর্মকে তাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত নতুবা শুধু মেয়েদের অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হলেই প্রজন্ম ধ্বংস হয় না বরং ছেলেদেরও অ-আহমদী বিয়ে করলে প্রজন্ম ধ্বংস হতে পারে। সকল আহমদীর বুঝা উচিত যে, কেবল সামাজিক চাপ বা আত্মীয়তার চাপে যেন কেউ আহমদী না হয় বরং ধর্ম বুঝে আহমদী

হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আহমদী ছেলেরা বাইরে বিয়ে করতে থাকে তাহলে আহমদী মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে? তাই ছেলেদেরকেও ভাবতে হবে। এই প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এই বিষয়ে এখনই সাবধানতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ কারও ওপর যদি খোদার কৃপা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। যেসব ছেলেরা বাইরে বিয়ে করে আমি অধিকাংশ সময় তাদেরকে বলি, আহমদী মেয়েদের অধিকার বা প্রাপ্যও তাদেরকে দাও। কোন কারণে বা কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে যদি তুমি বাইরে বিয়ে করে থাক তাহলে কোন যুবককে আহমদীয়াতভুক্ত কর এবং তাকে নিবেদিত প্রাণ আহমদী করে তোল, এরপর একটি আহমদী মেয়ের সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা কর। এরফলে তবলীগের প্রতিও তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর হতে পারে এই সচেতনতার কারণে তাদের নিজেদেরও আহমদী মেয়েদের সাথে বিয়ের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। যাহোক, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের সমস্যা রয়েছে আর এটি কেবল আজ নয় বরং শুরু থেকেই এমনটি চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আজকে কিছু বলতে চাই আর তাহলো, আহমদী এবং অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে সংক্রান্ত আর একই প্রেক্ষাপটে কুফু বা সমকক্ষতার প্রশ্নও আসে। আমাদের জামাতের সদস্যরা বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত যে সমস্যার সম্মুখীন হয় এটি আমি পূর্বেও জানতাম কিন্তু এই নয় মাস কালে অনেক সমস্যা এবং বাধা-বিপত্তি সামনে এসেছে। তাঁর খিলাফতে আসীন হওয়ার প্রায় নয় মাস পর জলসা সালানা হয়েছে, সেই যুগে তিনি এই বক্তৃতা দিয়েছেন, ১৯১৪ সনের বক্তৃতা এটি। তিনি (রা.) বলেন, মানুষের পত্রাবলী থেকে জানা যায় এই বিষয়ে আমাদের জামাত ভয়াবহ কষ্টে চরম কষ্টে নিপতিত। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এই সমস্যা এবং এই কষ্ট আজও বিদ্যমান এবং এই সমস্যা এখনও রয়েছে কিন্তু এসব সমস্যার সমাধানও আমাদের করতে হবে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে আহমদী ছেলে এবং মেয়েদের নাম একটি রেজিস্টারে লেখার প্রস্তাব করেন। কোন ব্যক্তির প্রেরণায় তিনি একটি রেজিস্টার খুলিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি বলেছিল, হুযূর! বিয়ে-শাদীর বিষয়ে আমাদের অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আপনি বলেন যে, গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রেখো না আর আমাদের জামাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এখন আমরা কি করব? তাই এমন একটি রেজিস্টার থাকা চাই যাতে সব বিবাহযোগ্য ছেলে এবং মেয়ের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে যেন বিয়ে-শাদীর বিষয়টি সহজসাধ্য হয়ে উঠে। হুযূরের কাছে কেউ অনুরোধ করলে সেই রেজিস্টার থেকে দেখে তার বিয়ে দিতে পারবেন কেননা; এমন কোন আহমদী নেই যে আপনার কথা মানবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই ব্যক্তি নিজেই এই কথা বলেছে। অনেকেই জাগতিক কোন স্বার্থ সামনে রেখে কথা বলে থাকে, এমন মানুষ অবশেষে অবশ্যই পরীক্ষা কবলিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অনেকেই অনেক সময় কোন সমস্যার কথা উপস্থাপন করে বা কোন কথা বলে কিন্তু ব্যক্তিগত কোন স্বার্থও তাতে অন্তর্নিহিত থাকে আর এ কারণে তারা পরীক্ষায়ও নিপতিত হয়। তিনি (রা.) বলেন, এ ব্যক্তির নিয়্যতও মনে হয় সঠিক

ছিল না। সেই সময়ই এক ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান ছিলেন, তার বিয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যে বলেছিল, রেজিস্টার থাকা উচিত, তার একটি কন্যা ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই ব্যক্তিকে বলেন, তুমি এর ঘরে প্রস্তাব দাও। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যার মেয়ে ছিল এবং যিনি রেজিস্টারের কথা বলেছিলেন তার কথা হচ্ছে। বিয়ের প্রস্তাব যখন আসে মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ঘরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক অজুহাত দেখিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র কোন অ-আহমদীর কাছে মেয়েকে বিয়ে দেয়। এটি অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আজ থেকে বিয়ে-শাদীর বিষয়ে আমি আর নাক গলাব না, আর এভাবে এ প্রস্তাবটি (রেজিস্টার সংক্রান্ত) অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তখন যদি এই কাজ বা এই বিষয়টি সফল হতো তাহলে আজকে আহমদীদের বিয়ে-শাদীর বিষয়ে যে কষ্ট হচ্ছে সেই সমস্যা আর হতো না। অনেক সময় নবীর সামনে একটি বিষয়ে 'না' বলা জামাতের জন্য স্থায়ী পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়। অ-আহমদী পরিবারে বিয়ের স্বল্পকাল পরেই অধিকাংশ আহমদী হাড়ে হাড়ে নিজেদের ভ্রান্তির কথা উপলব্ধি করে আর বড় বড় যেসব সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তাও স্পষ্ট হয়ে যায়। এখনও অনেকেই বরং মেয়েরা নিজেরাই বা পিতা-মাতাও লিখে যে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যার জন্য আজকে আমরা মূল্য দিচ্ছি, ধর্মের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, কারো শ্বশুরবাড়ীর লোকজন বা স্বামীরা মেয়েদের পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের সাথে স্বাক্ষাতের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে। কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা আমিত্ব এবং অহমিকার কারণে ভালো আহমদী ঘরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অথচ মেয়েরাও সম্মত থাকে আর ছেলেরাও বরং কোন কোন স্থানে আমি নিজেও বলেছিলাম, বিয়ে দাও বা বিয়ে কর কিন্তু অহমিকার কারণে তারা অস্বীকার করেছে। যাহোক, এমন মানুষ যদি থাকতে পারে যারা মসীহ্ মওউদের কথা মানতে অস্বীকার করেতো তাহলে আমার কথা অমান্য করা তেমন কোন বড় বিষয় নয়; কিন্তু এমন মানুষের পরিণামও বড় ভয়াবহ হয়ে থাকে। জার্মানিতে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে, পিতা-মাতা মেয়ের পছন্দ অনুসারে বিয়ে দেয়নি আর মেয়ের জোর দেয়ার কারণে বা জিদের বশবর্তী হয়ে অবশেষে মেয়েকেই হত্যা করেছে আর এখন কারাভোগ করছে। তাই আহমদী ছেলে এবং মেয়ে যদি পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের পিতামাতাকে অনর্থক হঠকারিতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বংশ পরিচয় বা আমিত্বের শিকার হওয়া উচিত নয়। বিয়ে শাদীর প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সামনে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যদিও মেয়ের পছন্দ-অপছন্দও দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিতে রাখা মহানবী (সা.) পছন্দ করেছেন। কিন্তু একইসাথে ইসলাম এ কথা মেনে চলাকে আবশ্যক আখ্যা দেয় যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যদি পাঠিয়ে থাকেন আর কার্যতঃই তিনি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকেন তাহলে আমাদের শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত একথাই বলে যে, সেসব ব্যতিক্রম ছাড়া যা শরীয়ত উল্লেখ করেছে কোন বিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। যদি এমন বিয়ে হয়ে যায় তাহলে সেটি অবৈধ এবং অসম্পূর্ণ হবে। এমন লোকদের বুঝানো আমাদের জন্য আবশ্যক। আর এরা যদি না বুঝে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করা আবশ্যক। এমন ঘটনা অনেক সময় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও ঘটেছে। একবার এক যুবতী মেয়ে এক ব্যক্তিকে বিয়ের বাসনা ব্যক্ত করে, তার পিতা তা গ্রহণ করেন নি। ফলে তাদের উভয়ে কাদিয়ানের পাশ্ববর্তী নাঙ্গলে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে এক মোল্লার দ্বারা বিয়ের এলান করায় আর বলতে আরম্ভ করে যে, বিয়ে হয়ে গেছে। এরপর তারা কাদিয়ান ফিরে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা অবগত হয়ে উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন, শুধু মেয়ের সম্মতি সাপেক্ষে ওলীর মতামতকে অবজ্ঞা করে বিয়ে করা শরীয়ত পরিপন্থী। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল, বলত যে আমি এই পুরুষকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু যেহেতু ওলীর মতামত না নিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়েছে তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন। অনুরূপভাবে মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও কোন বিয়ে হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, এই বিয়ে বৈধ। কিন্তু আমি ছেলের মাকে একথাই বলেছি, তুমি বলছ যে মেয়ে সম্মত ছিল তাই আমার ছেলে বিয়ে করলে অসুবিধা কী? তোমার ছেলের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তাই তুমি বলছ, মেয়ে সম্মত তাই ওলীর মতামতের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও মেয়ে আছে, যদি তাদের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাদের ঘরেও মেয়ে হবে। তাদের কারো কোন মেয়ে কোন ছেলের হাত ধরে ঘর থেকে পালিয়ে যাবে তা কি তুমি পছন্দ করবে? সুতরাং যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে, পিতামাতারও অনর্থক কঠোর হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ মিথ্যা আত্মভিমানের নামে কোন বৈধ কারণ ছাড়া বিয়ে দিবে না আর হত্যার মত পাশবিক কর্মকাণ্ড করে বসবে। আর মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে পালিয়ে আদালতে গিয়ে বা মৌলভীর কাছে গিয়ে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। বাধ্যবাধকতামূলক কোন পরিস্থিতি থাকলে মেয়েরাও খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখতে পারে। পরিস্থিতি অনুসারে খলীফায়ে ওয়াক্ত মারুফ বা ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত করবেন। তাইমেয়ে এবং ছেলেরা যদি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি দৃষ্টিপটে রাখে,তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ করবেন।

এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এ বিষয়টা বর্ণনা করছিলেন যে, যিকরে ইলাহীর জন্য এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, আল্লাহ্কে ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল, ঐশী গুণাবলী দৃষ্টিতে রেখে চিন্তা এবং প্রণিধান করা আর সেই গুণাবলীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দৃঢ় করা তবেই খোদা প্রেমের সঠিক ব্যুৎপত্তি অর্জন হয়।প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, জাগতিক ও বাহ্যিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্যও আবশ্যক হলো, যার সাথে ভালোবাসা থাকে তার নৈকট্য লাভ বা অন্ততঃপক্ষে তার কোন চিত্র বা তার কোন ছবি সামনে থাকা যেন উত্তরোত্তর সম্পর্ক এবং ভালোবাসা নিবিড় হয়। একথা উল্লেখ করতে গিয়ে বা এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল, হয়তো কারো সামনে স্বশরীরে উপস্থিতি বা তার ছবি থাকা। যেমন ইসলাম বলে, যাদের সাথে আত্মীয়তা করতে চাও তাদের চেহারা দেখে নাও। এটি নতুন কোন বিষয় নয়। তিনি (রা.) বলেন, ইসলাম বলে, বিয়ে করার পূর্বে চেহারা দেখ বা ছবি দেখে নাও। যেখানে সামনা-সামনি দেখা কঠিন সেখানে ছবি দেখা সম্ভব। আজকের যুগেও একই কথা প্রযোজ্য। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, যেমন আমার যখন বিয়ে

হয় আমি স্বল্পবয়স্ক ছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ডাক্তার রশীদ উদ্দীন সাহেবকে লিখেছেন, মেয়ের ছবি পাঠিয়ে দিন, তিনি ছবি পাঠিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ছবি দিয়েছেন। আমি বললাম, আমার এই মেয়ে পছন্দ, তখন তিনি সেখানে আমাকে বিয়ে করান। সুতরাং দেখা ছাড়া ভালোবাসা কীভাবে হতে পারে। এটি খোদা তা'লার সামনে আসার মত একটি বিষয়। এখন খোদাকে ভালোবাসার কথা আরম্ভ হয়ে গেছে? খোদা যদি সামনে আসেন আর তোমরা যদি চোখ ঢেকে রাখ এরপর বল, খোদার ভালোবাসা তাকে দেখা ছাড়াই বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তাহলে প্রশ্ন হলো, ভালোবাসা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পঙতি আছে, **"যদি দেখার সুযোগ না থাকে অন্তত পক্ষে কথা বলার সুযোগ থাকা উচিত।"**

বন্ধুর সৌন্দর্যের অন্তত:পক্ষে কিছুটা ছাপ হলেও থাকা উচিত অর্থাৎ কিছুতো অন্তত:পক্ষে হওয়া উচিত। প্রেমাস্পদ সামনে না আসলে কমপক্ষে তার কন্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়া উচিত, তার সৌন্দর্যের কোন ছাপ সামনে আসা উচিত, এটিই খোদা তা'লার ছবি। আল্লাহ্ তা'লার ছবি কি? 'রব্ব' অর্থাৎ বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক! এটি খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য, তিনি রহমান অর্থাৎ দয়ালু, রহীম অর্থাৎ কৃপালু, মালেকেইয়াওমিদ্দিন (বিচার দিবসের মালিক), তিনি ছাত্তার (দুর্বলতা গোপনকারী , কুদ্দুস (পবিত্র), মু'মিন (নিরাপত্তাদাতা), মোহাইমেন(তত্ত্বাবধায়ক), সালাম, (শান্তির উৎস), তিনি কাহ্হার(শাস্তিদাতা) এবং তাঁর অন্যান্য ঐশী গুণাবলীও রয়েছে। এই হল চিত্র যা হৃদয়ে গ্রোথিত করা উচিত। আমরা যদি অনবরত এই গুণাবলীর মাথায় যুগালী করি আর অনুবাদ করে এর অর্থ মাথায় গ্রোথিত করি তাহলে কোন বৈশিষ্ট্য খোদার কান হয়ে যায়, কোনটি খোদার চোখ হয়ে যায়, কোন বৈশিষ্ট্য খোদার হাত হয়ে যায় আর কোন বৈশিষ্ট্য খোদার অবয়ব হয়ে যায়। আর এভাবে সব বৈশিষ্ট্য সমবেতভাবে খোদার এক পূর্ণ ছবির রূপ নেয়। তাই খোদাকে ভালোবাসার জন্য এসব গুণ ধারণ করা এবং সেগুলো স্থায়ীভাবে দৃষ্টিতে রাখা প্রকৃত ঐশী প্রেমে মানুষকে ধন্য করে আর তবেই মানুষ খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টাও করে।

একজন প্রকৃত মু'মিনের ধর্মের জন্য আত্মাভিমান প্রদর্শন করা উচিত। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে আমি বার বার শুনেছি আর আমাদের মাঝে এখনো শত শত সাহাবী এমন জীবিত আছেন যারা শুনে থাকবেন যে, তিনি (আ.) বলেছেন, কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যারা নেক এবং পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে কোন সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে না। তিনি (আ.) বলতেন, এক ব্যক্তি ছিল, সে তার বন্ধুকে বললো যে, আমার মেয়ের জন্য কোন ছেলে বা সম্বন্ধ দেখ। কয়েকদিন পর তার বন্ধু এসে বলে যে, আমি উপযুক্ত ছেলের সন্ধান করেছি। পিতা জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের বৃত্তান্ত বলো, সে বলে, ছেলে খুবই ভদ্র এবং ভাল মানুষ। পিতা বলল, তার সম্পর্কে আরো কিছু বলো। সে বলে, আর কি জানতে চান, খুবই ভাল মানুষ। পিতা আবার বলল, আরও কিছু পরিচয় দাও শুধু ভাল মানুষ হওয়াই তো সবকিছু নয়, সে উত্তর দেয় আর কি বলব, আমি বললাম তো এ খুবই ভাল মানুষ। তখন মেয়ে পক্ষ বলে, যার ভাল মানুষ হওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই তারসাথে আমরা মেয়ে বিয়ে দিতে পারি না। তার কাজকর্ম বা অন্য কোন কিছুই

জানা নেই, শুধু ভাল মানুষ! কালকে যদি কেউ আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায় সে ভাল মানুষিবসতঃ মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে। কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যাদের কেবল ভদ্রতাই থাকে। তিনি (রা.) বলেন, ধর্মীয় বিষয়েও এমনটি হয়, আত্মাভিমান দেখা যায় না, কোন আবেগ উচ্ছাস দেখা যায় না। খুবই ভদ্র, খুবই ভাল মানুষ কিন্তু ধর্মীয় কোন আত্মাভিমান দেখা যায় না। সদিচ্ছার কারণে মু'মিন অবশ্যই আখ্যায়িত হয় কিন্তু তাদের ভাল মানুষ হওয়া স্বয়ং তাদের জন্য এবং জামাতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। তাই অবশ্যই আত্মাভিমান প্রদর্শিত হওয়া উচিত। সুতরাং যারা জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আপত্তি করে, অনেক সময় এমন ভাল মানুষ আপত্তিকারীদের বৈঠকে বা অধিবেশনে চুপটি মেরে বসে থাকে। এভাবে বসে থেকে তারা খুবই অন্যায় করে। শুধু ভাল মানুষ হওয়াই সবকিছু নয়। ভাল মানুষের এমন অধিবেশনে বসে থাকা আত্মাভিমান হীনতায় পর্যবসিত হয়। অন্ততঃপক্ষে যেখানে এরূপ আপত্তি হয় সেই বৈঠক ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে যাওয়া উচিত। অন্ততঃপক্ষে এতটা আত্মাভিমান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কথা যে বলে সে যদি স্থায়ী নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থাপনার কর্ণগোচর করা উচিত আর ব্যবস্থাপনার উচিত, এমন কথা খলীফায়ে ওয়াক্তের দৃষ্টিগোচর করা, যেন সমাধানকল্পে সমুচিত পদক্ষেপ নেয়া যায়।

অ-আহমদী মৌলভীরা কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সঞ্চার করত, তাদেরকে প্ররোচিত করত, কীভাবে মিথ্যার বেসাতি করত আর এখনও করে আর কীরূপ অপবাদ তার ওপর আরোপ করা হয় সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা বলছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও মানুষ 'সাহের' বা যাদুকর বলত। আমার মনে আছে, একজন বন্ধু শুনিয়েছেন, ফিরোজপুর অঞ্চলে এক মৌলভী বক্তৃতা করছিল যে, আহমদীদের বই-পুস্তক আদৌ পড়া উচিত নয়। অ-আহমদী মৌলভী মানুষকে বলছে যে, আহমদীদের বই-পুস্তক মোটেও পড়া উচিত নয় আর কোনভাবেই কাদিয়ান যাওয়া উচিত নয়। আর এই মিথ্যাবাদী একটি মনগড়া কথা নিজের দাবীর সমর্থনে সবাইকে শুনায়। বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজের কথাকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নিজেই বানিয়ে একটি ঘটনা শোনায় এবং বলে, একবার আমি কাদিয়ান যাই। আমার সাথে একজন রইস বা ধনাঢ্য ব্যক্তিও ছিল। আমরা কাদিয়ানে যাই, অতিথিশালায় অবস্থান করি এবং বলি যে, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করব। স্বল্পক্ষণ পরেই মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব আসেন এবং বড় সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন তার কিছুক্ষণ পরেই একজন আমাদের জন্য হালুয়া নিয়ে আসে আর মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব বলেন, এটি আপনাদের জন্য প্রস্তুত করানো হয়েছে। মৌলভী সাহেব বলেন, আমার জানা ছিল, তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হালুয়ায় জাদু করা হয়েছে, তাই আমি তা স্পর্শ করিনি। কিন্তু আমার সাথী জানত না তাই সে সেই হালুয়া খেয়ে ফেলে আর আমি কোন অজুহাতে সেখান থেকে সটকে পরি। মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব জানতে পারেন নি যে, আমি সেই হালুয়া খাইনি অর্থাৎ আমি এভাবে চালাকি করেছি। কিছুক্ষণ পর আমার সাথী যে হালুয়া খেয়েছে সে বলতে আরম্ভ করে, আমার হৃদয়ে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে যে, আমি বয়আত করতে চাই অর্থাৎ তার ওপর

হালুয়া কাজ করেছে। মৌলভী সাহেব বলেছেন, আমি তো খাইনি। তাই আমার ওপর এর কোন কার্যকারিতা ছিল না। স্বল্পক্ষণ পরেই মির্যা সাহেব তার ফিটন (গাড়ী) প্রস্তুত করান, তাতে তিনি স্বয়ং আরোহণ করেন এবং মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবকেওবসান আমাকেও সাথে নেন। মৌলভী সাহেবের মিথ্যার বেসাতি দেখুন! তিনি বলছেন, মির্যা সাহেব আমার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করেন আর আমিও পরীক্ষা করার জন্য ইতিবাচক সায় দেই, তিনি ভেবেছেন যে এ গ্রহণ করবে, কেননা হালুয়া খেয়েছে, তাই মানবে, হালুয়াতে যেহেতু জাদু করা ছিল। মৌলভী সাহেব বলেন, প্রথমে তিনি বলেন, আমি নবী, স্বল্পক্ষণ পরে বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.) থেকেও বড় নবী (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক) এরপর বলেন, আমি খোদা, নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা এমন কথা থেকে খোদা আশ্রয় কামনা করি)। এসব কথা শুনে আমি বললাম আস্তাগফিরুল্লাহ্, এসব কিছুই মিথ্যা। তখন মির্যা সাহেব নূরউদ্দীন সাহেবকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এদেরকে হালুয়া খাওয়ানো হয়নি কী? এর ওপর জাদুর কোন প্রভাবই দেখা যাচ্ছে না। খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, খাইয়েছিলাম কিন্তু জাদুর কোন প্রভাব পড়েনি, আশ্চর্যই বটে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও অনেক সময় অকুস্থলেই এদের মিথ্যা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন আর এখানেও তাই ঘটে। সেই বৈঠকে মৌলভী সাহেবের একজন অ-আহমদী আইনজীবীও বসে ছিলেন কিন্তু তিনি ভদ্র অ-আহমদী ছিলেন, যিনি কোন যুগে এখানে খলীফা আউয়ালের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। একথা শুনে অর্থাৎ সেই মৌলভী সাহেবের কথা শুনে উকিল সাহেব দাঁড়িয়ে যান আর বলেন, মৌলভীদের সম্পর্কে আমার পূর্বেও সুধারণা ছিল না। আমি জানতাম এরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে আমি বুঝতে পারছি, এদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর হয় না। উকিল সাহেব মানুষকে বলেন, আপনারা জানেন আমি আহমদী নই, কিন্তু আমি চিকিৎসার জন্য স্বয়ং সেখানে গিয়েছিলাম এবং অবস্থান করেছি, মৌলভী যত কথা বলেছে সবই মিথ্যা, ফিটন তো দূরের কথা সেখানে কোন ঘোড়ার গাড়ীও নেই, সে যুগে টমটম গাড়ীর ব্যবহারের প্রচলন ছিল, মৌলভী সাহেব ফিটন বা চার চাকা বিশিষ্ট্য গাড়ীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সেটি দাঁড় করানো হয়েছে আর তাতে মসীহ্ মওউদ (আ.) আরোহণ করেছেন এবং খলীফা আউয়ালকে বসিয়েছেন আর আমাকেও বসিয়েছেন। ফিটনের কোন ধারণাই সে যুগে কাদিয়ানে ছিল না এমনকি টমটম গাড়ীও ছিল বিরল। খোদা তা'লার বিস্ময়কর কুদরত দেখুন! মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এ ঘটনা বর্ণনা করছেন তখন পর্যন্ত সেখানে ফিটনের কোন ধারণাই ছিল না। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, এখনো এমন মানুষ আছে যারা মনে করে যে, এখানে জাদু করা হয়। এর কারণ হলো তারা দেখে যে, যারাই জামাতভুক্ত হয় তারা মার খায়, তাদেরকে গালি দেয়া হয়, অসম্মান করা হয়, তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তারপরও এরা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে থাকে, আহমদীয়াতকে পরিত্যাগ করে না, তারা মনে করে, দৈহিক নির্যাতন এবং ক্ষয়ক্ষতির মুখে এদের ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু তাদের ব্যবহারে এদের ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না নিশ্চয়ই কোন জাদু করা হয় আর এ কারণেই এভাবে ঈমানের ওপর অবিচল থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এসব মিথ্যাবাদীর হাত থেকে উম্মতকে রক্ষা করুন আর মানুষকে সত্য চিনার তৌফিক দিন আর আমাদেরকেও স্ব-স্ব দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াবো। একটি হলো জানাযা হাযির যা ছকিনা নাহিদ সাহেবার জানাযা, তার পিতার নাম হল, মরহুম মোহাম্মদ দ্বীন— তিনি জম্মু কাশ্মীরের অধিবাসী । তার স্বামীর নাম হল, শেখ মোহাম্মদ রশিদ, ৩রা এপ্রিল ৯০ বছর বয়সে তিনি এখানে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুমার বংশে তার পিতার মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে, কাশ্মীরে বিরোধিতা সত্বেও তিনি ১৬ বছর বয়সে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বিয়ের পর পাঠানকোটে বসতি স্থাপন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং উম্মুল মু'মিনীন যখনই সেখানে যেতেন তাদের আতিথেয়তার তিনি সুযোগ পেয়েছেন। দেশ বিভাগের পর স্বামীর সাথে বদ্দুমাহলী স্থানান্তরিত হন, সেখানে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত লাজনার সদর হিসেবে জামাতের কাজের তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৭৪ সনে বিরোধীরা তার বাড়ীঘর লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনি একান্ত ধৈর্যের সাথে সেই সময় অতিবাহিত করেছিন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হন,পরম আন্তরিকতার সাথে শিশুদের কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। নিযাম এবং খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন, অসুস্থতা এবং বার্ধক্য সত্বেও রীতিমত আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। খুবই নিষ্ঠাবতী, নেক, তাহাজ্জুদ গুযার, নামায, রোযায় অভ্যস্ত, পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে তিনি স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হচ্ছে জনাব শওকত গণী শহীদ সাহেবের, যিনি কাজী আব্দুল গণী সাহেবের পুত্র। আজাদ কাশ্মীরের নাধিরীর অধিবাসী আর আজকাল বসবাস করছেন রাবওয়াতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সিপাহী হিসাবে বেলুচিস্তানের পাসনীতে অপারেশন যারবে আযবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে সন্ত্রাসীদের আকস্মিক গোলাগুলির ফলে ২১ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মৌলভীরা অপবাদ আরোপ করে যে, আহমদীরা দেশের শত্রু, অথচ শাহাদত এবং ত্যাগ স্বীকারকারী আসলে আহমদীরাই। শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার বড় দাদা কাজী ফিরোজ উদ্দিন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে, যিনি কাজী খায়রুদ্দীন সাহেবের পুত্র। তিনি আজাদ কাশ্মীরের গই থেকে জনাব মাহবুব আলম সাহেবের সাথে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামাতভুক্ত হন। তার সাথে শহীদের বড় নানা জনাব বাহাদুর আলী সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। জনাব ফিরোজ উদ্দীন সাহেবের পরিবার 'গই'তে মসজিদের ইমাম ছিলেন, এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি রাখতেন। জনাব ফিরোজ উদ্দীন সাহেব-এর বয়আতের পর তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বয়কট এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্বেও আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই নিষ্ঠাপূর্ণ ও নিবেদিতপ্রাণ বংশ ছিল কাজী ফিরোজ উদ্দীন সাহেবের। তার হাঁপানীর ভয়াবহ কষ্ট ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার অনুরোধ করলে হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্

তা'লা আরোগ্য দান করবেন। এই দোয়ার কল্যাণে তার ভয়াবহ হাঁপানী রোগ থেকে তিনি স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করেন। আশি বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। শহীদ মরহুমের পিতা আব্দুল গণী সাহেব ২০১৩ সনে তার পরিবার সহ কাশ্মীর থেকে হিজরত করে রাবওয়া স্থানান্তরিত হন এবং এখানেই বসতি স্থাপন করেন। শহীদের জন্ম নাধিরীতে হয়েছে, আজাদ কাশ্মীরের নাধিরীতে ১৯৯৫ সনে ৪ মে তার জন্ম হয়। তিনি মেট্রিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন, দেড় বছর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনীতে সিপাহী হিসেবে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষ করে পাসইন আউট ট্রেড শেষ হওয়ার পর আজকাল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তানে যে অপারেশন হচ্ছিল সেখানে গোয়াদের সেক্টরে নিযুক্ত ছিলেন। ২ এবং ৩ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাতে শাহাদতের ঘটনা ঘটে। শাহাদতের পর শহীদের মরদেহ সড়কপথে করাচী থেকে লাহোর হয়ে রাবওয়ায় আনা হয়। এখানে সামরিক মর্যাদায় তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি ওসীয়্যতও করেছিলেন এছাড়া বহু গুণের আধার ছিলেন। মিশুক হওয়া ছাড়াও, অতিথি পরায়ণতা এবং সহমর্মিতার গুণাবলী তার মাঝে স্পষ্ট ছিল। সবাইকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল, পোষ্টিং-এর কারণে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে থাকতেন সেখানেও ফোনে সরাসরি খুতবা শুনতেন। শাহাদতের দু'দিন পূর্বে তার সাকুল্য চাঁদা তিনি পরিশোধ করেন। তার কণ্ঠ ছিল খুবই সুললিত। কর্মক্ষেত্রে একবার একটি অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি নযম সুললিত কণ্ঠে অ-আহমদীদের সামনে পাঠ করেন। অনেক অ-আহমদী সেখানে উপস্থিত ছিল যারা তার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে, এত সুন্দর কবিতা কে লিখেছে? আমরা এর পূর্বে এমন সুন্দর কবিতা কোথাও শুনি নি। তার মাঝে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ, একবার চাকরীর প্রথম দিকে চার মাসের বেতন একসাথে পান তখন আরেকজন সৈনিক শাহাদত বরণ করলে তিনি পুরো বেতন সেই শহীদের পরিবারের হাতে তুলে দেন অথচ ঘরের একমাত্র ভরণপোষণকারী ছিলেন এই শহীদ। শহীদ মরহুমের পিতা বলেন, শাহাদতের রাতে স্বপ্নে দেখি যে, পরিবারের যেসব বুযূর্গ ইন্তেকাল করেছেন শহীদ মরহুম তাদের সাথে বসে আছে, তখন তার চেহারায় খুবই শুভ্র এক আলোর কীরণ পড়ছিল যার কারণে তার চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠে যা অন্যান্যদের মাঝে খুবই স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছিল। রাবওয়ায় অবস্থানকালে জামাতের বিভিন্ন কাজ করেছেন যেমন, যয়ীমও ছিলেন, উমুমীর দায়িত্বও পালন করতেন। এক মসজিদে খাদেম হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছেন। তিনি বিয়ে করেন নি, শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা আব্দুল গণী এবং মা গোলাম ফাতেমা সাহেবা, দু'ভাই এবং দু'বোন রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবোল দান করুন। শহীদ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসী ছিলেন, যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জুমুআর পর ইনশাআল্লাহ্ আমি উভয়ের জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।